করেন, "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে"। অর্থাৎ, "যদি সেই কার্য-কারণের চরম আশ্রয় দৃষ্ট হয় বা তার উপলব্ধি হয়, তবে সকল কর্মের ক্ষয় হয়" (মুণ্ড ২/২/৮)। "আনন্দং ব্রহ্মণঃ বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।" অর্থাৎ "যে ব্যক্তি জানেন যে ব্রহ্মের স্বরূপ হল আনন্দ তিনি কখনও কোন কিছু থেকেই ভীত হন না" (তৈ. ২/৯) "অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তঃ অসি" অর্থাৎ "হে জনক, আপনি অভয়কে পেয়েছেন" (বৃহ. ৪/২/৪)। "তং আত্মনমেব বেত্তি অহম্ ব্রহ্মাস্মি ইতি, তস্মাৎ তৎ সর্বম্ অভবৎ" অর্থাৎ "তিনি (জনক) ব্রহ্মকে আমিই ব্রহ্ম"—এ রূপে জানেন এবং তাই তিনিই সকল বস্তুর স্বরূপ হয়ে যান" (বৃহ ১/৪/১০)। "তত্র কঃ মোহ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ" অর্থাৎ "তখন ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি হতাশা ও দুঃখকে অতিক্রম করেন" (ঈশ. ৬)। এই শ্রুতিবাক্যগুলি মুক্তিলাভের ক্ষেত্রে পূজা, উপাসনা ইত্যাদির অবদান সম্পর্কে কোন কথা বলে নি। ব্রহ্মজ্ঞান ও মুক্তি লাভের মধ্যে কোন প্রকার অন্তর্বর্তী ক্রিয়া নেই। উদাহরণস্বরূপ, যখন বলা হয়, "কোন স্থানে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি সংগীত পরিবেশন করেছেন", তখন এই বাক্যের "কোন স্থানে দাঁড়িয়ে" এবং "সংগীত পরিবেশন করছেন"—এই দুটি অংশের মধ্যে কোন মধ্যবর্তী ক্রিয়া নেই। মুক্তি কোন নূতন ফলরূপ ব্রহ্মজ্ঞান নয়। "ইতি চ এবমাত্মা শ্রুতয়ঃ মোক্ষপ্রতিবন্ধনিবৃত্তিমাত্রম্ এব আত্মজ্ঞানস্য ফলম্ দর্শয়ন্তি।" অর্থাৎ "ব্রহ্মজ্ঞান মোক্ষ ও আমাদের মধ্যে অজ্ঞান বা অবিদ্যা রূপ যে বাধা আছে তা দূর করে", [ব্রহ্মসূত্র : শঙ্করভাষ্য, ১/১/৪, ২য় বর্ণক, বেদান্তদর্শনম্—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ সম্পাদিত, পৃ. ১৬০]। জীব ও ব্রহ্মের অভেদকে কোন ব্যক্তি প্রতীকী অর্থে গ্রহণ করতে পারেন, মনে করা যাক, যদিও জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্য আছে, তথাপি কোন কোন পরিপ্রেক্ষিতে তারা অভিন্ন—এরকম মনে করা যেতে পারে। কিন্তু যদি আমরা এরকম মনে করি, তবে "তত্ত্বমসি", "অহং ব্রহ্মাস্মি" (আমিই ব্রহ্ম)—ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বাক্যের আক্ষরিক অর্থ পরিত্যাগ করতে হয় এবং আমাদের ইচ্ছানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিতে হয়। এ শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার (উপক্রম, উপসংহার ইত্যাদি) আদর্শ নিয়মকে লঙ্ঘন করে। তাছাড়া, এ প্রকার অবান্তর চিন্তা জীবের অবিদ্যা দূর করতে পারে না। জীব ও ব্রহ্মের অভেদের জ্ঞান হলেই এই অবিদ্যার অবসান হয়। সুতরাং আক্ষরিক অর্থে জীব ও ব্রহ্মকে অভিন্ন বলে মেনে নিতে হবে এবং ব্রহ্মের জ্ঞানকে বস্তুগতভাবে যথার্থ বলতে হবে। জীব অথবা ব্রহ্মের বিষয়গত যথার্থতা প্রত্যক্ষাত্মক বা অনুমানমূলক যে কোন প্রকার যথার্থ জ্ঞানের মতই হয়। এ বিষয়গত এই অর্থে যে এ কোন

ব্যক্তির মানসিক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে না কিন্তু এ জ্ঞান বিষয়ের স্বরূপের দ্বারা নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে যে বিষয়কে জানতে হবে তা হল জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা। যা হোক, আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয়ীভূত নয়। কেনোপনিষদে ব্রহ্ম সম্পর্কে এরূপ ধারণা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছে। কেনোপনিষদে বলা হয়েছে, ব্রহ্ম জানা-অজানার ঊর্ধ্বে (কেনো. ১/৪)। যার দ্বারা সমস্ত কিছু জানা যায় তাকে কিসের দ্বারা জানা যাবে? বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই প্রশ্ন করা হয়েছে (বৃহ. ২/৪/১৪)। এই প্রশ্নের তাৎপর্য হল এই যে, ব্রহ্ম কোন জ্ঞানমূলক ক্রিয়ার বিষয় নয়। কেনোপনিষদে ব্রহ্মকে পূজার বিষয় হিসাবেও অস্বীকার করা হয়েছে (কেনো. ১/৫)।

শঙ্করের মতে, মোক্ষ কোন প্রকার কর্মের ফল নয়। তিনি চার প্রকার কর্মের কথা বলেছেন, যেমন, উৎপাদন, পরিবর্তন (modification), প্রাপ্তি (obtaining) ও বিশুদ্ধিকরণ (purification) এবং যুক্তিসহ বলেন যে এই প্রক্রিয়াগুলি মুক্তিলাভের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক এবং অসম্ভব প্রক্রিয়া। যদি মুক্তি এমন হয় যা উৎপন্ন হবে, তবে এর উৎপাদনের জন্য মানসিক বা শারীরিক কোন প্রকার ক্রিয়ার প্রয়োজন হবে। ব্রহ্মসূত্রে বলা হয়েছে, "যস্য তু উৎপাদ্যো মোক্ষঃ, তস্য মানসং বাচিকং বা কার্যম্ অপেক্ষতে ইতি যুক্তম্" (ব্রহ্মসূত্র : শঙ্করভাষ্য, ১/১/৪, ২য় বর্ণক, বেদান্তদর্শনম্—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ সম্পাদিত, পৃ. ১৭০)। যদি কোন পরিবর্তিত অবস্থা (modified state) হয়, তবে এই পরিবর্তনের জন্যও কোন প্রকার ক্রিয়ার প্রয়োজন হবে। "তথা বিকার্যত্বে চ" (ব্রহ্মসূত্র : শঙ্করভাষ্য, ১/১/৪, ২য় বর্ণক, বেদান্তদর্শনম্—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ সম্পাদিত, পৃ. ১৭০)। উৎপাদন ও পরিবর্তন একমাত্র অনিত্য বস্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন, দুধের পরিবর্তিত অবস্থা দধি কখনও নিত্য হয় না। যত্নের দ্বারা উৎপন্ন বস্তুও স্থায়ী নয়। যা হোক, মোক্ষ হল নিত্য ও অপরিবর্তনীয়। সুতরাং এটা উৎপাদন ও পরিবর্তনের ফল নয়। মোক্ষ কোন লভ্য (attainable) বস্তুও নয়। ব্রহ্মসূত্রে বলা হয়েছে, "ন চ আপ্যত্বেনাপি কার্যাপেক্ষা স্বাত্মস্বরূপত্বে সতি অনাপ্যত্বাৎ" (ব্রহ্মসূত্র : শঙ্করভাষ্য, ১/১/৪, ২য় বর্ণক ; স্বামী বিশ্বরূপানন্দ সম্পাদিত, পৃ. ১৭১)। কোন স্থানে গিয়ে আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রাপ্তি হয়। যেমন ক্রিয়ার দ্বারা কোন ফুল বা ফল পাওয়া যায় এবং গমনের দ্বারা কোন স্থানের প্রাপ্তি হয়। কিন্তু এ প্রকার ক্রিয়া মুক্তিলাভের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে অপ্রাসঙ্গিক। মোক্ষ জীবের স্বরূপকে গঠিত করে। তাই এটা পূর্বেই প্রাপ্ত বলে লভ্যও (attainable) নয়। তাছাড়া, যা অসীম ও সর্বব্যাপী,

সেক্ষেত্রে পৌঁছানো বা পাওয়ার প্রশ্ন অবান্তর। কোন কিছুর প্রাপ্তি বলতে বোঝায় তার স্থানান্তরে অবস্থান, যা বিভু ও সর্বব্যাপী সত্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। মোক্ষ ও ব্রহ্ম অভিন্ন বা একই। যেহেতু এটা সমস্ত স্থানেই অবস্থিত তাই এটা এমন কিছু নয় যা কোন ক্রিয়ার দ্বারা লাভ করা যাবে।

মোক্ষ কোন বিশুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ার ফলও হতে পারে না। কোন দোষের অপসারণ বা কোন উৎকর্ষের সংযোগের দ্বারা কোন বস্তুকে বিশুদ্ধ করা হয়। কিন্তু ব্রহ্ম চিরন্তনরূপে ও শাশ্বতরূপে বিশুদ্ধ। তাই এতে কোন উৎকর্ষের সংযোগ অথবা কোন দোষের অপসারণের প্রশ্ন ওঠে না। এতে কোন উৎকর্ষের অভাব নেই, কোন দোষও নেই।

সম্ভবত এরকম বলা যায় যে, যদিও জীবের মুক্ত অবস্থা আছে, তবু এটা লুক্কায়িত আছে বলে এর প্রকাশের জন্য অর্থাৎ এর অব্যক্ত অবস্থার দূরীকরণের জন্য কোন বিশুদ্ধিকরণ ক্রিয়ার প্রয়োজন। দর্পণের উপরিভাগে ঘর্ষণের ফলে ময়লা অপসারিত হওয়ায় দর্পণের যেমন পরিষ্কার চেহারা প্রকাশ পায় এও সেরকম। অর্থাৎ দর্পণের প্রকৃত স্বভাব ব্যক্ত হয় ঘর্ষণ ক্রিয়ার ফলে। কিন্তু মুক্তির ক্ষেত্রে এরকম ইঙ্গিত খাটে না। কারণ আত্মা বা ব্রহ্ম কোন ক্রিয়ার আশ্রয় হতে পারে না। যদি তাই হয় তবে মুক্তি পরিবর্তনশীল হয়ে পড়বে। কোন ক্রিয়া পরিবর্তন সূচনা করে। পরিবর্তন ব্যতীত কোন ক্রিয়া সম্ভব হয় না। কোন ক্রিয়া বা কর্ম যার উপর প্রযুক্ত হয় তাকে এবং তার আশ্রয়কে পরিবর্তিত করে। সুতরাং আত্মা যদি তার উপর প্রযুক্ত কোন ক্রিয়ার দ্বারা প্রকাশিত হত, তবে তার পরিবর্তন হত। কিন্তু যদি এতে কোন পরিবর্তন হয় তবে এর অপরিবর্তনীয় স্বভাব থাকে না অর্থাৎ এটা অনিত্য হয়ে পড়ে। এরূপ স্পষ্টতঃই স্বীকার করা যায় না কারণ তা আত্মা সম্পর্কে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় উক্তির বিপক্ষে যায়। যেমন—ভগবদ্গীতা বলেন,

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে। ২৪

অর্থাৎ, এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য। ইনি সর্বব্যাপী, স্থির, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিকার্য বলে কথিত হন। (ভগবদ্গীতা—২/২৪)

তথাপি, কেউ এরূপ আপত্তি করতে পারেন যে সাধারণতঃ আমরা স্বীকার করি যে কোন ব্যক্তি শারীরিক ক্রিয়াদি যথা, হস্তপদাদি ধৌতকরণ, স্নান ইত্যাদি

দ্বারা পবিত্র হন। এক্ষেত্রে উক্ত ক্রিয়ার দ্বারা আত্মা পবিত্র হয় বলে ধরে নিলে ভুল হবে। ধৌতকরণ, স্নান ইত্যাদি দেহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আত্মার সঙ্গে নয়। অতএব এ সকল ক্রিয়ার দ্বারা বস্তুতঃ যা পবিত্র হয় তা আত্মা নয়, তা হল দেহ। এক্ষেত্রে অবিদ্যা হেতু দেহকে আত্মা বলে ভ্রম হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন কারও কোন ডাক্তারী চিকিৎসায় শারীরিক কষ্ট দূর হয়, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবে আরোগ্যলাভ করেছেন বলে অনুভব করেন। এখানে যা আরোগ্যলাভ করেছে তা হল দেহ, আত্মা নয়, কারণ আত্মা হল দেহ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন যা বিশুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ। অবিদ্যাবশতঃ যিনি নিজেকে দেহের সঙ্গে অভিন্ন বলে ভুল করেন, তিনি নিজেকে অসুস্থ বলে বা আরোগ্যলাভ করেছেন বলে ভুল করেন। কিন্তু এ প্রকার ভ্রম আত্মাকে কোনভাবে প্রভাবিত করতে পারবে না। সুতরাং শৌচ, স্নান ইত্যাদির দ্বারা যা পবিত্র হয় তা আত্মা নয়, তা হল দেহ এবং দেহকেই পবিত্র বা অপবিত্র বলে অভিহিত করা যেতে পারে। [ব্রহ্মসূত্র : শঙ্করভাষ্য, ১/১/৪ (২য় বর্ণক), বেদান্তদর্শনম্—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ সম্পাদিত, পৃ. ১৭৩]

এ থেকে আমরা দেহবিশিষ্ট আত্মা ও বিশুদ্ধ আত্মা—এ দু' প্রকার আত্মার কথা বলতে পারি। দেহবিশিষ্ট আত্মা (**embodied self**) হল আমাদের অহং-বোধের বিষয়। এই আত্মা আমাদের সকল প্রকার কর্ম সম্পাদন করে। বিশুদ্ধ আত্মা দেহবিশিষ্ট আত্মা বা শরীরী আত্মা থেকে ভিন্ন ধরনের। বিশুদ্ধ আত্মা কোন প্রকার কর্ম সম্পাদন করে না এবং তাই কর্মের কোন রকম ফলভোগও করে না। এই প্রসঙ্গে আমরা মুণ্ডক উপনিষদের (৩/১/১) বিখ্যাত শ্লোকটির উল্লেখ করতে পারি যেক্ষেত্রে একত্রে বসবাসকারী দু'টি পাখী-বন্ধুর কথা সাংকেতিকভাবে উল্লেখ করা আছে। এখানে একটি পাখী বিশুদ্ধ আত্মা (**pure-self**)-কে বোঝাচ্ছে এবং অন্যটি দেহযুক্ত আত্মাকে (**embodied self**) বোঝাচ্ছে। পাখী দু'টি একই বৃক্ষে বাস করে অর্থাৎ তারা একই দেহে অবস্থিত। একটি পাখী গাছটির মিষ্ট ফল ভক্ষণ করে, কিন্তু অন্যটি তা করে না, শুধুমাত্র তা লক্ষ্য করে। অর্থাৎ দেহযুক্ত আত্মা নিজেকে তার ক্রিয়ার কর্তা বলে মনে করে এবং নিজেকে এর ফলের ভোক্তা বলে মনে করে। বিশুদ্ধ আত্মা কোন প্রকার কর্মের সঙ্গে জড়িত নয় কিন্তু তা এক নির্লিপ্ত সাক্ষীর মত অবস্থান করে। সুতরাং বিশুদ্ধ আত্মা সকল প্রকার বিশোধক ক্রিয়ার উর্ধ্বে।

মূল কথা হল এই যে, মোক্ষলাভের ক্ষেত্রে কোনপ্রকার কর্মের স্থান নেই কিন্তু এর জন্যে একমাত্র জ্ঞানই প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত বিষয়। এখানে, একটা প্রশ্ন হল :

Scanned with CamScanner

জ্ঞান কি একটি মানসিক ক্রিয়া নয় ? উত্তরে বলা যায় জ্ঞান কোন মানসিক ক্রিয়া নয়। ক্রিয়া (তা মানসিক হলেও) ও জ্ঞানের মধ্যে একটা মূল পার্থক্য আছে। কোন কর্ম করা সম্পূর্ণরূপে মানুষের ইচ্ছা বা পছন্দের উপর নির্ভর করে। কেউ তার ইচ্ছানুসারে কোন কাজ করতে পারে বা নাও করতে পারে। অপরপক্ষে জ্ঞান নির্ভর করে কোন প্রমাণ বা যথার্থ জ্ঞানলাভের উপায়ের উপর এবং তা কারও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। যে বস্তুর জ্ঞান লাভ করতে হবে তার প্রকৃতির দ্বারা জ্ঞান নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ যখন উপযুক্ত শর্তগুলি পূর্ণ হয় তখন জ্ঞান হয়। আমাদের পছন্দের বা ইচ্ছার উপর জ্ঞান নির্ভর করে না। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায়, জ্ঞান কোন প্রকার আদেশ বা কোন মানসিক ক্রিয়ার সাহায্যে লাভ করা যায় না। মানসিক ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিকেন্দ্রিক কিন্তু জ্ঞান সর্বদা ব্যক্তিনিরপেক্ষ বা বিষয়গত। ব্রহ্মরূপে জীবের জ্ঞানও বিষয়গত এবং তা মানুষের ইচ্ছা বা পছন্দের উপর নির্ভর করে না।

মোক্ষের প্রকারভেদ ঃ

শঙ্করের অদ্বৈতবেদান্তে দু'প্রকার মুক্তির কথা বলা হয়েছে ঃ (১) জীবন্মুক্তি ও (২) বিদেহমুক্তি। দেহের উপস্থিতিতে যে মুক্তি তা হল জীবন্মুক্তি। দেহান্তর প্রাপ্তির পর মুক্ত অবস্থাকে বলা হয় বিদেহমুক্তি। ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে অবিদ্যা দূরীভূত হলে ধর্ম, অধর্ম, সংশয়, ভ্রম প্রভৃতি অপসারিত হয়। ব্রহ্মরূপ চরম জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই দেহ ধ্বংস নাও হতে পারে, মুক্ত ব্যক্তি কিছুদিন দেহধারণ করে যেতে পারেন। যে ব্যক্তির ব্রহ্মোপলব্ধি হয়েছে এবং দেহ বর্তমান আছে তাঁকে জীবন্মুক্ত বলা হয়। মুক্ত অবস্থায় তিনি এ জগতে বাস করেন। জীবন্মুক্তির সমর্থনে শ্রুতিতে অনেক উক্তি লক্ষ্য করা যায়। যেমন, "যখন ব্রহ্মোপলব্ধি হয়, তখন হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সকল সংশয় দূরীভূত হয় এবং কর্মের ক্ষয় হয়" (মুণ্ডক উপ. ২/২/৮)। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" অর্থাৎ "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হন" (মুণ্ডক উপ. ৩/১/৯)। "তরতি শোকমাত্মবিদ্" অর্থাৎ "আত্মজ্ঞানী শোককে (দুঃখসমূহকে) নিবৃত্তি করেন" (ছা. উপ. ৭/১/৫)। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪/৪/৭) উক্ত হয়েছে যে "তিনি (জীবন্মুক্ত) এ জগতেই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন।" "এ জীবনে ও এ জগতে যদি ব্রহ্মকে জানা না যায় তবে চরম ক্ষতি হয়" (কেনো উপ. ২/৫)। শ্রুতি বলেন, "যদিও জীবন্মুক্ত ব্যক্তির চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মন ও প্রাণ আছে, তথাপি তাঁকে চক্ষুহীন, কর্ণহীন, মনহীন ও

প্রাণহীন বলে বোধ হয়।" অর্থাৎ, "সচক্ষুরচক্ষুরিব, সকর্ণোঽ অকর্ণ ইব, সমনা অমনা ইব, সপ্রাণোঽ অপ্রাণ ইব" ইত্যাদিশ্রুতেঃ (সদানন্দ যোগীন্দ্রের বেদান্তসার- কালীবর বেদান্তবাগীশ অনূদিত, পৃ. ২১১)। জীবন্মুক্তি সম্পর্কিত মতবাদ অনুসারে, এই জীবনেই মুক্তিলাভ করা সম্ভব এবং আত্মজ্ঞান লাভের পর দেহ কিছুকালের জন্য থেকে যেতে পারে। মুক্ত ব্যক্তির এই জগতে অবস্থান কালে প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগ হয়। প্রারব্ধ কর্ম বলতে সেই কর্মগুলিকে বোঝায় যেগুলি ফল উৎপাদন করতে শুরু করেছে এবং এই কর্মের ক্ষয় একমাত্র ভোগের দ্বারাই সম্ভব হয়। তবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গেই সঞ্চিত ও ক্রিয়মান কর্মের ক্ষয় হয়। অর্থাৎ আত্মজ্ঞানীর কর্মগুলি তাঁর মধ্যে সঞ্চিত থাকে না যার ফলে পরবর্তী জীবনে তাঁকে এর ফল ভোগ করতে হবে কারণ তাঁর আর কোন পরবর্তী জীবন থাকে না। মুক্তিলাভের পর মুক্ত ব্যক্তির কর্মগুলি তাঁকে আবদ্ধ করে না বা সেগুলি কোন ফল প্রসব করে না কারণ তাঁর কর্মগুলি ব্যক্তিগত অহং প্রসূত নয় বরং সেগুলি জগতের কল্যাণের জন্যই তাঁর দ্বারা কৃত হয়। যদি তিনি কিছু করেন তবে তিনি তার ফলের প্রতি আসক্ত না হয়ে আবেগহীনভাবে ঈশ্বরের হস্তের যন্ত্রস্বরূপ কাজ করেন। যদি জীবন্মুক্তি স্বীকার না করা হয় তবে সম্ভবতঃ মুক্তিই অসম্ভব হবে পড়বে। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির দৈহিক অস্তিত্ব থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে কর্ম করে যেতে হয়। এবং যতক্ষণ কর্ম থাকে ততক্ষণ চরম জ্ঞানের আবির্ভাব হতে পারে না কারণ কর্ম সর্বদা বন্ধনে আবদ্ধ করে। কর্ম থাকলে তার কর্তৃত্ববোধ থাকে ও কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে এবং আকাঙ্ক্ষা যে ফল উৎপন্ন করে তা অবশ্যই ভোগ করতে হয়। এই কর্মফল ভোগ করার জন্য তাকে আবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই ক্রম চলতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যুর এই চক্র ঘুরে ঘুরে আসে এবং তাই মুক্তিলাভ আর সম্ভব হয় না।

মুক্তি যদি লভ্য (attainable) হয়, তবে তা এ জীবনে ও এ জগতেই লাভ করা যাবে এবং এজন্য কোন অপার্থিব জগতে যেতে হবে না। এরকম কোন গ্যারান্টি নেই যে আত্মোপলব্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেহের বিনাশ হবে। এই উপলব্ধির পর জ্ঞানী কিছুদিনের জন্য দেহধারণ করে থাকতে পারেন। আবার যদি দেহ থাকে তবে কর্মও থাকবে, কর্ম বন্ধনের হেতু হওয়ায় কর্ম থাকলে আত্মজ্ঞান লাভ হবে না এবং তাই স্থায়ীভাবে সংসারে আবদ্ধ থাকতে হবে। এই কারণে সিদ্ধান্ত করা যায়, জীবন্মুক্তি স্বীকার করতে হবে নতুবা মুক্তিই অসম্ভব হবে। তাই অদ্বৈতবেদান্তে জীবন্মুক্তি একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়।

Scanned with CamScanner

জ্ঞানীগণ বলেন যে জীবন্মুক্ত ব্যক্তি জাগ্রত অবস্থাতেও যেন সুষুপ্তিতে অবস্থান করেন, বৈচিত্র্যের মধ্যেও তিনি এক পরম সত্যকেই দর্শন করেন। যদিও তিনি জাগতিক কর্ম করেন, তবুও তিনি প্রকৃত পক্ষে নিষ্ক্রিয়। তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বা যান্ত্রিকভাবে বা অভ্যাসগতভাবে কাজ করেন, কোন প্রকার ব্যক্তিগত স্বার্থলাভের ইচ্ছা বা অহং-এর দ্বারা পরিচালিত হয়ে কাজ করেন না।

যদি জীবন্মুক্ত ব্যক্তি না থাকতেন, তবে জ্ঞানী উপদেষ্টা গুরু বলে কেউ থাকতেন না। এক্ষেত্রে ব্রহ্মাত্মজ্ঞানী অর্থাৎ যাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছে তিনিই পরম গুরু। নির্ভরযোগ্য উপনিষদগুলিতে বা মূল শাস্ত্রীয় আকর গ্রন্থগুলিতে সত্য-দ্রষ্টার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাগুলি লিপিবদ্ধ আছে। এজন্যই ঐ মূল গ্রন্থগুলির প্রামাণ্য স্বীকার করা হয়। ব্রহ্মের সাক্ষাৎ-জ্ঞান বলতে মুক্তিকেই বোঝায়। সত্যদ্রষ্টাগণ হলেন এরকম ব্যক্তি অর্থাৎ তাঁরা হলেন জীবন্মুক্ত। তাঁরা হলেন অধ্যাত্মজ্ঞানের যথার্থ ও উত্তম গুরু। এভাবে মুমুক্ষুর প্রতি জীবন্মুক্তির ধারণা নির্ভরযোগ্য ও দৃঢ় বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। কেবলমাত্র উপনিষদের ঋষিরাই যে মুক্ত ছিলেন এমন নয়, পরবর্তীকালে যুগপরম্পরায় বহু মুক্ত ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শঙ্করের অনুগামীদের মতে, শঙ্করাচার্য নিজেই ছিলেন জীবন্মুক্ত।

জীবন্মুক্তির সপক্ষে আর একটি যুক্তি হল জীবন্মুক্তি অনুভূতি বা উপলব্ধি বা অভিজ্ঞতার ব্যাপার। এ প্রকার অনুভূতির বর্ণনা আমরা প্রাচীন ঋষিদের স্ব স্ব অভিজ্ঞতা থেকে পাই। উপনিষদগুলি এরূপ অভিজ্ঞতার প্রকাশ। শঙ্কর তাঁর দর্শনে শ্রুতির প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শ্রুতি হল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। শঙ্করের মতে শ্রুতি হল জ্ঞানীদের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা। প্রত্যক্ষ বা অনুভবের মত শ্রুতি নিজে নিজেই যথার্থ যেহেতু বিজ্ঞ ব্যক্তির আন্তর ও সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতাই এতে প্রকাশিত হয়। এ জন্যই ব্রহ্মজ্ঞান ও দেহধারণের মধ্যে যে কোন দ্বন্দ্ব নেই, উপনিষদই তার প্রমাণ। জীবন্মুক্তি অস্বীকার করলে প্রকারান্তরে শ্রুতিকেই অস্বীকার করা হয় এবং শ্রুতিকে অস্বীকার করার অর্থ হল মানবজীবনের চরম অনুভূতিকেই অস্বীকার করা।)

তাছাড়া স্মৃতিতেও জীবন্মুক্তি সম্ভব একথা ঘোষণা করা হয়েছে। জীবন্মুক্তির স্বরূপ সম্পর্কে যোগবাশিষ্ঠ একটা অত্যন্ত সুন্দর ও অনুপম উক্তি করেছেন : "হে রাঘব, আপনি আন্তরিকভাবে সর্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষামুক্ত, নিরাবেগ ও নিরাসক্ত, কিন্তু বাহ্যদৃষ্টিতে কর্মে আকৃষ্যমান কিন্তু অন্তরে যে কোন প্রকার আকর্ষণ মুক্ত, বাহ্যদৃষ্টিতে সক্রিয়, অন্তরে শান্ত ও জাগতিক আচরণে অভ্যস্ত।...হে রাঘব,

Scanned with CamScanner

আপনার হৃদয় অনাসক্ত, কিন্তু বাহ্যদৃষ্টিতে যেন আসক্ত, আপনার অন্তর প্রশান্ত, কিন্তু বাহ্যদৃষ্টিতে আপনি প্রবল উৎসাহে কর্মে ব্যস্ত।"

যা হোক, জীবন্মুক্তির বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ আছে। বলা হয়েছে যে, অবিদ্যা বা কর্মের ফল হল দেহ এবং ব্রহ্মাত্মজ্ঞানরূপ মুক্তি হল অশরীরত্ব (bodilessness)। ব্রহ্মজ্ঞানের আবির্ভাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ফলসহ অবিদ্যাকে দূরীভূত হওয়া উচিত। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেহপাত হওয়া উচিত এবং তারপর কোন কর্ম থাকতে পারে না। যেহেতু আলো ও অন্ধকার কখনও একত্রে থাকতে পারে না, ঠিক তেমনি পরম জ্ঞান ও কর্ম একত্রে থাকতে পারে না। এ ভাবে জীবন্মুক্তির তত্ত্বের সমালোচনা করা হয়েছে।

উক্ত অভিযোগগুলির জবাবে বলা যায় যে, শুধুমাত্র কর্ম নিজে অবিদ্যা এবং বন্ধনের কারণ নয়। যে কর্ম মানুষকে বন্ধনে আবদ্ধ করে তা হল সকাম কর্ম। নিষ্কাম-কর্ম জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক। বন্ধনের কারণ হল কাম, কর্ম নয়। বিভিন্ন শ্রুতিতে মুক্ত ব্যক্তির কর্ম স্বীকার করা হয়েছে (যেমন, ছা. উপ. ৮/১২/৩, ব্রহ্মসূত্র ২/৩/৩১—৩২)। কর্ম যদি বন্ধনের কারণ হত, তবে আমরা শ্রুতিতে উক্ত আত্মা ও ব্রহ্মের আনন্দময় (সুখময়) কর্মের ব্যাখ্যা করতে পারতাম না। এজন্য আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে ফলাকাঙ্ক্ষা বা আসক্তিই হল বন্ধনের মূল কারণ, শুধুমাত্র কর্ম সম্পাদন বন্ধনের কারণ নয়।

মোক্ষের সাধন ঃ

শঙ্কর বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেন যে উচ্চতম জ্ঞানই হল মোক্ষলাভের প্রত্যক্ষ উপায়। উচ্চতম জ্ঞানের ফল কিন্তু মোক্ষ নয় কারণ যদি তা-ই হয় হয়, তবে মোক্ষ কর্মের ফলের মত অনিত্য হয়ে পড়বে। উচ্চতম জ্ঞানই হল মোক্ষ। ভগবদ্গীতা ও তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিক্ষাবলীর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে শঙ্করাচার্য বলেন যে মুক্তি একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই লাভ করা সম্ভব এবং তা কর্ম বা জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়ের দ্বারাও লাভ করা যায় না। কর্ম কেন মুক্তিলাভের উপায় হতে পারে না তা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। বৈচিত্র্যময় জগৎ হল ব্রহ্মের উপর আরোপিত মায়া। আমরা এমনকি কর্ম বা ভক্তির দ্বারাও আমাদের প্রাতাহিক অবিদ্যা বা মায়াকে অতিক্রম করতে পারি না। একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই মায়া বা অবিদ্যা দূরীভূত হতে পারে। সুতরাং মায়া বা অবিদ্যার বিনাশরূপ মুক্তি কেবল জ্ঞানের দ্বারাই লভ্য।)

Scanned with CamScanner

শঙ্কর জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয় ও জ্ঞানোত্তর কর্ম—এই দুই মতবাদের সমালোচনা করেছেন। বৈষ্ণব বৈদান্তিকগণ এবং সমসাময়িক ভারতীয় চিন্তাবিদগণ যথা, বাল গঙ্গাধর তিলক শঙ্করের এই দুই মতবাদের সমালোচনার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই মতের সমালোচনাকে সম্পূর্ণরূপে ভুল বোঝা হয়েছে। (অনেক লোক মনে করেন যে শঙ্করের মতে মুমুক্ষু ব্যক্তির সকল কর্ম ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু আসলে তিনি তা নির্দেশ করেন নি। শঙ্কর সকল কর্মত্যাগের কথা বলেন নি। তাঁর মতে এমনকি মুক্ত ব্যক্তিও সকল কর্ম ত্যাগ করতে পারেন না। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত দেহ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কর্মত্যাগ করা যায় না। আবার যতক্ষণ পর্যন্ত প্রারব্ধ কর্মের ভোগ শেষ না হয় (বা প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় না হয়) ততক্ষণ পর্যন্ত কর্মত্যাগ করা যায় না। কিন্তু মুক্ত ব্যক্তির কর্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। মুক্ত ব্যক্তির কোন অপূর্ণ কামনা নেই এবং তিনি কামনার পরিতৃপ্তির জন্য কোন কর্ম করেন না। তাঁর সকল কর্ম-ই ঈশ্বরের কর্ম এবং তিনি তাঁর হাতের যন্ত্র ছাড়া কিছুই নন তাঁর কর্মগুলি কৃত হয় শুধুমাত্র জগতের জনগণের মঙ্গলের জন্য। যদি তিনি কর্ম করেন, তবে তা অন্যের প্রতি দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়। তাঁর কর্মগুলি জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট অর্থাৎ তিনি তাঁর কর্মের দৃষ্টান্ত দ্বারা অন্যকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

কর্ম ও ভক্তি মোক্ষলাভের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ উপায় নয় কিন্তু সেগুলি যথার্থ জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। কর্ম ও ভক্তি মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তির মনকে পবিত্র করে। মন বিশুদ্ধ হওয়ার পরই একমাত্র কোন ব্যক্তির জ্ঞান হতে পারে। আবার যদিও উপনিষদের "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যটি আত্মা ও ব্রহ্মের অভেদ বোঝায় অথবা যদিও পবিত্র মন ব্রহ্মোপলব্ধির পক্ষে একটি যন্ত্রস্বরূপ, তথাপি একথা বলা যায় না যে, যাঁদের এরূপ মনরূপ যন্ত্র আছে তাঁরা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। যদি আত্মোপলব্ধির পথে বাধাস্বরূপ অধর্ম থাকে তবে জ্ঞান লাভ সম্ভব হয় না। অধর্মের বিনাশ হলে ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। ধর্মগত আচার অনুষ্ঠান বা পালনের দ্বারা অধর্মের ক্ষয় হয়। আমরা শাস্ত্র থেকে বৈদিক আচার বা ক্রিয়া সম্বন্ধে জানতে পারি এবং এ প্রকার আচারের অনুষ্ঠানের ফলে মন বিশুদ্ধ হয়। এ প্রকার মন জাগতিক বস্তুর দোষ প্রত্যক্ষ করে। এই দোষ দর্শন ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কর্মফলের ভোগের প্রতি উদাসীন ভাব উৎপন্ন করে। এই উদাসীনতা ক্রমে শ্রবণ মনন, নিদিধ্যাসনের প্রতি এবং অবশেষে মোক্ষের প্রতি মনকে আকৃষ্ট করে। এই কারণে বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলেন, ব্রাহ্মণগণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

বস্তুর নিরাবেগ ভোগের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বেদ অধ্যয়ন, সেবা, পরোপকার, কঠোর আত্মসংযম-এর দ্বারা পরম পুরুষার্থ বা মোক্ষের স্বরূপ জানার চেষ্টা করেন। শ্রুতি বলেন—"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রহ্মন বিবিদিসন্তি যজ্ঞেন দানেনতপসঃ অনাসকেন"—বৃহ. ৪/৪/২২। আবার স্মৃতি বলেন, যখন ধর্মমূলক আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা মনের দোষ অপসারিত হয়, তখনই জ্ঞানের প্রকাশ হয়। যথা—"কষায়ে কর্মভিঃ পক্কেততো জ্ঞানম্ প্রবর্ততে"—স্মৃতি। এই জন্য, যদিও কর্ম মুক্তিলাভের প্রত্যক্ষ উপায় নয়, তবুও শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে কর্ম এক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে।

শঙ্করের মতে মোক্ষলাভের ক্ষেত্রে ভক্তির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন ভেদ নেই। ব্রহ্ম হল জীবের একমাত্র আদর্শ রূপ। এই কারণে, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বলতে কোন জীবের উচ্চতম আদর্শ রূপের প্রতি ভক্তি বোঝায়। শঙ্করের মতে, "ভক্তি হল আমাদের উচ্চতর আবেগশূন্য ও শান্তিপূর্ণ প্রকৃত আত্মার ধ্যান।"* এটা হল জীবের নিজস্ব যথার্থ প্রকৃতির অনুসন্ধান। জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। ঈশ্বরের বিশুদ্ধ ভক্তি জীবের ব্রহ্মভাব জাগ্রত করে। ব্রহ্মভাব হল "আমি "ব্রহ্ম হতে ভিন্ন নই" এ প্রকার জ্ঞান। আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে ভক্তির চেয়ে অধিকতর উপযোগী আর কিছুই নেই। শঙ্কর তাঁর বিবেক চূড়ামণি, ৩২ গ্রন্থে লিখেছেন, "মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।" শঙ্কর বলেন যে মোক্ষলাভের পূর্বে প্রার্থনারও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতি স্তোত্র সম্বলিত শঙ্করের বহু রচনা প্রমাণ করে যে মোক্ষলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তি বা মুক্ত ব্যক্তির কর্ম ও ভক্তি ত্যাগ করা উচিত নয়। কিন্তু এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে বৈষ্ণব বেদান্তিকগণ মনে করেন যে শঙ্কর মুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে কর্মত্যাগের কথা প্রচার করেছেন। শঙ্কর কর্মত্যাগের উপর জোর দেন নি কিন্তু কর্মের মধ্যে থেকে ফলাকাঙ্ক্ষা বা আসক্তিত্যাগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শঙ্করের মতবাদ আমরা জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মযোগের একটা যথার্থ সমন্বয় দেখতে পাই।

শ্রবণ, মনন, এবং নিদিধ্যাসন—এই পদ্ধতিগুলির সাহায্যেও আত্মসাক্ষাৎকার সম্ভব হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য আত্মসাক্ষাৎকারকে উদ্দেশ্য করে তার সাধনরূপে "শ্রোতব্যো, মন্তব্যো, নিদিধ্যাসিতব্য" (শ্রবণ, মনন, নিনিধ্যাসন

* P. N. Shrinivasachari : A Synthetic view of Vedanta, p. 17

কর্তব্য) এই উক্তির দ্বারা শ্রবণ, মননও নিদিধ্যাসনের বিধান দিয়েছেন (বৃহ, ২/৪/৫, ৪/৫/৬)। এখন প্রশ্ন হল, শ্রবণ বলতে কি বোঝায়? শ্রবণ হল বেদান্ত-বাক্যসমূহের অদ্বিতীয় ব্রহ্মে তাৎপর্য নির্ণয়ের অনুকূল বিচাররূপ মানসিক ক্রিয়া অর্থাৎ বৈদান্তিক গ্রন্থের অভিপ্রায় হল অদ্বিতীয় ব্রহ্মের তাৎপর্য নির্ণয় করা। মনন হল শ্রবণের দ্বারা নির্ণীত বিষয়ে প্রত্যক্ষ, অনুমান ইত্যাদি অন্য প্রমাণের বিরোধের আশঙ্কা উপস্থিত হলে সেই বিরোধী যুক্তি খণ্ডনের অনুকূল তর্করূপ জ্ঞানের অনুকূল মানসিক ক্রিয়া। নিদিধ্যাসন হল অনাদি দুর্বাসনাবশতঃ বিষয়সমূহে আকৃষ্যমাণ চিত্তকে বিষয়সমূহ থেকে ফিরিয়ে এনে আত্মবিষয়ে স্থির করার অনুকূল মানসিক ক্রিয়া।

আত্মদর্শনের কারণ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন—এই তিনটি হলেও এরা সকলে মিলিতভাবে কারণ নয় যেহেতু এদের সকলের যুগপৎ অবস্থান বা অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। একের অনুষ্ঠানের সময় অন্যটির বিনাশ হয় বলে সকলের সমুচ্চয় হতে পারে না। সুতরাং তিনটি কারণের মধ্যে নিদিধ্যাসনই আত্মোপলব্ধিতে সাক্ষাৎকারণ। কারণ শ্রুতিতে বলা হয়েছে "নিদিধ্যাসনরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ মায়াশক্তিকে উপলব্ধি করেছেন।"* নিদিধ্যাসনের পূর্বের মানসিক অবস্থা বা ব্যাপার হল মনন। মনন ক্রিয়া অনুসরণ না করলে নিদিধ্যাসনের বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে বিশ্বাস উৎপন্ন হতে পারে না। বেদান্তবাক্যের অর্থ নিশ্চিত না হলে নিদিধ্যাসন সম্ভবই হয় না। তাই মননকে নিদিধ্যাসনের কারণ বলা হয়। আবার শ্রবণ হল মননের হেতু। শ্রবণ ব্যতীত কোন ব্যক্তি বেদান্তবাক্যের অর্থ বা অভিপ্রায় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারে না এবং তার ফলে কোন শাব্দিক জ্ঞান সম্ভব হয় না। অদ্বৈত ব্রহ্ম সম্পর্কে শাব্দবোধের অভাবে যা শ্রবণ করা হয় তার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য যে মনন ক্রিয়া তা সম্ভব হয় না। ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্রের মতে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন হল ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের হেতু।

বিবরণ সম্প্রদায় উপরিউক্ত মত স্বীকার করেন না। বিবরণকারের মতে শ্রবণ হল ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎ কারণ। মনন ও নিদিধ্যাসন যদিও শ্রবণের পরকালীন, তথাপি এরা শ্রবণের অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

সমালোচনা ঃ

আমরা পূর্বে পরম পুরুষার্থের স্বরূপ প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্যের মতবাদ আলোচনা

---

* তেধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্—শ্বে. উপ., ১/৩

করেছি। এখন আমরা এই মতবাদের সমালোচনামূলক কয়েকটি মন্তব্য উপস্থাপিত করবো।

১। পরম পুরুষার্থ বা মোক্ষকে চরম লক্ষ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মোক্ষ হল নিত্য, অপরিবর্তনীয়, অশরীরিত্ব, ব্রহ্ম ইত্যাদি। মোক্ষ সম্পর্কে এ সকল সমস্ত তথ্য শাস্ত্র বেদান্তের মূল গ্রন্থ (ব্রহ্মসূত্র, উপনিষদ, ভগবদ্গীতা) থেকে পাওয়া যায়। তাই মোক্ষের প্রতি বিশ্বাস এ সকল মূল গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস থাকার উপর নির্ভর করে। যাঁরা শাস্ত্রকে বিশ্বাস করেন না, তাঁরা মোক্ষকে একটা মূল্যহীন তুচ্ছ বস্তু, একটা আকাশকুসুম কল্পনা বলে মনে করেন। যাঁরা শাস্ত্র ইত্যাদির কর্তৃত্ব স্বীকার করেন তাঁরা মনে করেন যে বেদের আলোচ্য বিষয়গুলি উপলব্ধিজাত সত্যের প্রকাশ এবং কোন ব্যক্তি যদি উপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করেন তবে তিনি সেই সত্য লাভ করতে পারেন। কিন্তু এই প্রস্তাবিত পদ্ধতি শুধু অত্যন্ত জটিলই নয়, এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ করতে বহুজীবন অতিক্রম করতে হবে। পরজন্মের অস্তিত্ব সম্পর্কে যার সংশয় আছে তিনি এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে উৎসাহী হবেন না। অধিকন্তু এখানে দার্শনিক আলোচনায় কথাটি বোঝানো হয়েছে এবং মোক্ষকে তত্ত্বগত ভাবে বোঝানো হয়েছে কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে ও অনিবার্যভাবে মোক্ষলাভ সম্ভবত হয় না। সুতরাং এই ব্যাপারে শ্রুতির প্রতি আস্থা রাখা যাবে কিনা এই প্রশ্ন করা হলে তার উত্তরে বিশেষ কিছু লাভ করা যাবে না। বরং মোক্ষের ধারণাটি বোধগম্য কিনা এবং যুক্তিপূর্ণভাবে সমর্থনযোগ্য কিনা সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করতে পারি।

২। শঙ্কর ও অন্যান্য অদ্বৈতবাদীদের মতে মুক্তি ও ব্রহ্ম অভিন্ন। ব্রহ্ম অপরিবর্তনীয়। সুতরাং মুক্তিও অবশ্যই অপরিবর্তনীয়। অদ্বৈতবাদীগণ একে অপরিবর্তনশীল ও শাশ্বত বলে মনে করেন। ব্রহ্ম হওয়ায় এ (মুক্তি) চিরস্থায়ী এবং কখনও অনুপস্থিত থাকতে পারে না। কিন্তু যদি কোন বস্তু সর্বদাই উপস্থিত থাকে, তবে কি তা মানুষের লক্ষ্য হতে পারে? লক্ষ্য বলতে কি বোঝায়? এ হল তা যা পূর্বে প্রাপ্ত হয় নি কিন্তু ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে বলে দাবি করা হয়। যখন বলা হয় মোক্ষ লাভ করা বা ব্রহ্মের ক্ষেত্রে প্রাপ্তি সম্ভব নয়, তখন কি মোক্ষ মানুষের লক্ষ্য হওয়ার পক্ষে অযোগ্য হয়ে পড়ছে না? তাহলে কিভাবে এটা মানবের কেবলমাত্র লক্ষ্যই নয়, পরম লক্ষ্যও হয়ে উঠবে? একই সঙ্গে যদি বলা হয় মোক্ষ হল মানবের উচ্চতম লক্ষ্য এবং তা পূর্বেই আছে তবে কি পরস্পর বিরোধী কথা বলা হচ্ছে না?

Scanned with CamScanner

দু'প্রকার প্রাপ্তির মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে শঙ্কর ও অন্যান্য অদ্বৈতবাদীগণ এই অসুবিধা দূর করতে চেষ্টা করেছেন : (১) যা পূর্বে প্রাপ্ত হয় নি তার প্রাপ্তি (২) যা পূর্বেই প্রাপ্ত হয়েছে তার প্রাপ্তি। মোক্ষলাভ হল দ্বিতীয় প্রকার প্রাপ্তি। কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে এটা বোঝানোর চেষ্টা করা যাক, যেমন, (ক) রজ্জুতে সর্পভ্রম (খ) কোন বস্তু যা প্রকৃতপক্ষে হারায় নি তার অনুসন্ধান ও খুঁজে পাওয়া (গ) মেঘের গতির ফলে সূর্যের উপর আচ্ছাদন ও সূর্যের প্রকাশ।

রজ্জুতে সর্পভ্রমের দৃষ্টান্ত, রজ্জুকে প্রথমে সর্প বলে ভ্রম হয় এবং পরে যখন সংশোধিত হয়, তখন বোঝা যায় যে সেখানে সর্প ছিল না, সেখানে রজ্জুই ছিল। একইভাবে যখন কোন একটি বস্তুর (যেমন, একটি হাতঘড়ির) বহু অনুসন্ধানের পর যখন দেখা যায় বস্তুটি তার নির্দিষ্ট স্থানেই আছে, তখনও বোঝা যায় যে প্রকৃতপক্ষে তা হারায় নি। আবার ঠিক একইভাবে, মেঘের গতির ফলে সূর্যের দৃষ্টির অন্তরালে যাওয়া ও দৃষ্টির গোচরে আসার জন্য সূর্যের কোন পরিবর্তন হয় না। একইভাবে মোক্ষের অনুসন্ধান এবং তার প্রাপ্তি মোক্ষের কোন পরিবর্তন করতে পারে না কারণ এ হল নিত্য ও অপরিবর্তনীয়।

কিন্তু এক্ষেত্রে দৃষ্টান্তসহ প্রদত্ত জবাবটি সন্তোষজনক হয় নি। কারণ তুলনাগুলি মূল জায়গাতেই অচল। একথা সত্য যে সর্পভ্রম রজ্জুকে প্রভাবিত করে না কিন্তু এখানে ভ্রমাত্মক অবস্থা থেকে জ্ঞানের অবস্থাতে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সদৃশরূপেই, কোন বস্তু হারিয়ে গেছে মনে করার পর ঐ বস্তু দৃষ্টিগোচর হওয়ার ক্ষেত্রে বস্তুটির অনুসন্ধান এবং দর্শন হল যথার্থ এবং এক্ষেত্রেও পরিবর্তন সহজ-বোধ্য। সূর্যমেঘের দৃষ্টান্তেও মেঘ ও তার গতি উভয়ই সত্য। সুতরাং এই দৃষ্টান্ত-গুলির প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে প্রকৃত পরিবর্তন আছে। অথচ মোক্ষের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে এক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন নেই। অতএব দৃষ্টান্তগুলি মোক্ষের প্রাপ্তের প্রাপ্তিরূপ বৈশিষ্ট্য অথবা এর অপরিবর্তনীয়তা সুস্পষ্টরূপে ও বোধগম্যভাবে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

৩। মুক্তিকে জীবের পরম পুরুষার্থ বলা হয়েছে। অর্থাৎ এ হল প্রত্যেক ব্যক্তির চরম লক্ষ্য। কেবলমাত্র মানুষই আত্মসাক্ষাৎকারের জন্য উৎসাহী হতে পারে। ব্রহ্ম নিজেই সত্য হওয়ায় মোক্ষলাভে আকাঙ্ক্ষী হতে পারে না। ব্রহ্মের লক্ষ্য মোক্ষ—এরকম বলার কোন অর্থ হয় না কারণ মোক্ষই হল ব্রহ্ম এবং কোন দিক দিয়ে এদের মধ্যে কোন ভেদ নেই। কোন ব্যক্তি যা পায় নি সেরকম কোন

Scanned with CamScanner

বস্তুই খোঁজে। কোন ব্যক্তির নিজেকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে না কারণ তার নিজের অস্তিত্ব পূর্ব থেকেই বর্তমান আছে।

কিন্তু যদিও মুক্তিকে প্রত্যেক ব্যক্তির পরম পুরুষার্থ বা লক্ষ্য বলা হয়েছে তবুও এটা ব্যক্তিসত্তার ধ্বংসকেই বোঝায়। যখন মুক্তিলাভ হয় তখন ব্রহ্মের উপলব্ধি হয় কারণ মুক্তি ও ব্রহ্ম একই। এ দুই-এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু যখন ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হয়, তখন সমস্ত ব্যক্তিসত্তার অবসান হয় কারণ ব্রহ্ম হল সর্বপ্রকার ভেদরহিত এবং সমস্ত সত্তার সম-প্রকৃতি যুক্ত যাতে কোন প্রকার ভেদ স্বীকার করা হয় না। সুতরাং কোন ব্যক্তির সচেতনভাবে মোক্ষলাভ করতে চাওয়ার অর্থ হল তার নিজেরই ধ্বংস হোক এটা চাওয়া। অদ্বৈতমতে সকল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হল অধ্যাসমূলক বা ভ্রান্তিজনক। আত্মদর্শন হলে এই ভ্রম দূরীভূত হয়। কিন্তু কোন ব্যক্তির পক্ষে সচেতনভাবে তার নিজের সম্পূর্ণ ধ্বংসকে লক্ষ্য বা আদর্শ হিসেবে চাওয়া কি সম্ভব? আমি কি আমার নিজের জন্য এমন কোন আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হব যা উপলব্ধি করলে আমার নিজেরই কোন অস্তিত্ব থাকবে না? লক্ষ্য বা আদর্শকে পাওয়ার চেষ্টা করে কে? ব্রহ্ম নিশ্চয়ই নয়। তাহলে ব্যক্তিই সম্ভবত এটা লাভ করতে পারে। কিন্তু আদর্শ বা উদ্দেশ্যটি লাভ করতে গিয়ে যদি ব্যক্তির অস্তিত্বই না থাকে তবে সে তা কিভাবে লাভ করবে? অতএব যদি ব্যক্তি ভ্রমাত্মক বা মিথ্যা অবভাস হয়, তবে শুধু বন্ধন নয়, মুক্তিও ভ্রান্তিজনক বা মিথ্যা অবভাসমাত্র হবে। সুতরাং মোক্ষ ভ্রমাত্মক ব্যক্তির ভ্রমাত্মক আদর্শ হয়ে পড়ে; তাহলে এক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, বন্ধন ও মুক্তি—এই তিনের কোনটিই থাকে না। শুধু তাই নয়, আমাদের বক্তব্য হল এই যে, মুক্তিকে সচেতন ভাবে লক্ষ্য বা আদর্শ বলার কোন অর্থ হয় না। কারণ কোন ব্যক্তির দ্বারা মোক্ষ বা পরম পুরুষার্থের উপলব্ধি সম্ভব হয় না যেহেতু মোক্ষলাভ করলে তার অস্তিত্ব থাকে না। আত্মহত্যা করা যেতে পারে, কিন্তু তা লাভ করা বা উপলব্ধি করা যায় না। আত্মহত্যাকে কোন ব্যক্তির পরিপূর্ণ অবস্থা বললে তা হাস্যকর বা অযৌক্তিক হবে। এটা জীবের পূর্ণতা নয় কিন্তু এটা হল জীবের সম্পূর্ণ ধ্বংস। যদি আত্মহত্যা পূর্ণতার প্রাপ্তি না হয় তবে মোক্ষও তা হয় না। মোক্ষের অবস্থাটি আরো ত্রুটিপূর্ণ কারণ যেক্ষেত্রে আত্মহত্যা করা যেতে পারে, সেক্ষেত্রে মোক্ষলাভ করা যৌক্তিক-ভাবে অসম্ভব, কারণ মোক্ষ ভ্রমাত্মক ও অসম্ভব আদর্শ। মুক্তির অদ্বৈত আদর্শটি তাই দুর্বোধ্য ও অসম্ভব আদর্শ বলে পরিগণিত হবে।

৪। শঙ্করের জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তির পার্থক্য অদ্ভুত বলে মনে হয়।

Scanned with CamScanner

এ প্রকার বিভাগের যৌক্তিকতা আছে কিনা এ ব্যাপারে সংশয় দেখা দেয়। মুক্তি যদি অশরীরত্ব বা ব্রহ্ম হয়, তবে তার দু'প্রকার রূপ—একটি দেহযুক্ত ও অন্যটি দেহহীন—কিভাবে সম্ভব? যতদিন পর্যন্ত কোন ব্যক্তি মুক্ত না হয় ততদিন পর্যন্তই তার দেহ বর্তমান থাকে। ব্রহ্মাত্মজ্ঞান হলে জ্ঞানী উপলব্ধি করেন যে সবই এক, কোন ভেদ নেই। কোন ব্যক্তি যার আত্মোপলব্ধি হয়েছে তার কাছে কি দেহের বিদ্যমানতা ও অবিদ্যমানতার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে? যার এ জ্ঞান হয়েছে যে দেহ মিথ্যা অবভাস মাত্র, তিনি কি করে মনে করবেন তাঁর এ দেহ কিছুকালের জন্য থাকবে এবং তারপর তিনি তা পরিত্যাগ করবেন? তিনি কিভাবে নিজেকে কিছুকালের জন্য জীবন্মুক্ত এবং তারপর বিদেহ মুক্ত ভাববেন? মুক্তি যদি অশরীরত্বের উপলব্ধি হয় তবে মুক্ত ব্যক্তির কাছে মুক্তির কোন বিভাগ থাকতে পারে না। এই দৃষ্টি থেকে প্রথমে দেহযুক্ত এবং পরে দেহহীন—মুক্তির এ প্রকার স্তর থাকতে পারে না।

জীবন্মুক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যেহেতু একমাত্র ভোগের দ্বারাই প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় হয়, তাই জীবন্মুক্তি স্বীকার করা হয়। কিন্তু এই যুক্তিটি দুর্বল ও বিশ্বাসযোগ্য নয়। যদি ব্রহ্মাত্মজ্ঞান সঞ্চিত ও ক্রিয়মান কর্মকে ধ্বংস করতে পারে তবে এই জ্ঞান প্রারব্ধ কর্মকে স্পর্শ করতে পারে না—এরকম মনে করা হয় কেন?

এই সমস্ত কারণে পারমার্থিক দৃষ্টিতে (জ্ঞানপ্রসূত দৃষ্টিতে) বা মুক্ত ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সম্ভবত বলা যায় যে দু'প্রকার মুক্তি স্বীকার যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু বদ্ধাবস্থায় স্থিত ব্যক্তির দৃষ্টিতে বা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে (অজ্ঞানপ্রসূত দৃষ্টিতে) মুক্তির এই শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে। সম্ভবত তাদের ক্ষেত্রে এরকম বলা ঠিক হবে যে জ্ঞানী বা মুক্ত ব্যক্তি কিছুকালের জন্য দেহধারণ করেন এবং মৃত্যুর সময় দেহ পরিত্যাগ করেন। এমন কি এ ক্ষেত্রেও মুক্ত ব্যক্তির দেহধারণ ব্যাখ্যা করার জন্য প্রারব্ধ কর্ম স্বীকার করা অপ্রয়োজনীয়। কারণ আমাদের এরকম মনে করার কোন প্রয়োজন নেই যে মুক্ত ব্যক্তি আমাদের মত সুখ, দুঃখ ভোগ করেন এবং অবিদ্যাজনিত কর্মের অধীন। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে তাঁর কর্মগুলি স্বার্থজনিত কর্ম নয়। যদি তিনি কোন কর্ম করেন তবে সেই কর্মগুলি নিজের জন্য করেন না, জনগণের কল্যাণ বা লোকশিক্ষা বা লোকসংগ্রহের জন্যই তিনি কর্ম করেন।

Scanned with CamScanner